হোটেল জীবন

ইমদাদুল হক মিলন

এখন বলি সিনডেলফিনগেনের হলিডে ইন হোটেলের কথা। উনিশশো বিরাশি সালে সাত/ আট মাস সেই হোটেলে কাজ করেছিলাম আমি। আমার পদ ছিল হাউসম্যান। অর্থাৎ বাড়ির লোক। পরিষ্কার বাংলায় চাকর। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ভাষায় 'হাউসকিপার'। হলিডে ইন আমেরিকান হোটেল, কেতাই আলাদা। বাড়ির চাকরকেও টাই পরে থাকতে হয়। টাই জিনিসটা আমার তেমন পছন্দ নয়। বিক্রমপুরের লোকেরা শ্লেষ করে টাইকে বলে 'কুত্তার জিবলা'। অর্থাৎ কুকুরের জিভ। জীবনে প্রথম টাই পরেছিলাম আটাত্তর/ উনআশি সালে, সঙ্গে লাল ডোরাকাটা ব্লেজার। ব্লেজারটা আমার বড় ভাইয়ের। পাসপোর্টের ছবি তোলার জন্য তখন কোট-টাই পরার নিয়ম ছিল। ব্লেজারটা বড় ভাই দিয়েছিলেন, টাইটা দিয়েছিল যে স্টুডিও থেকে ছবি তুলেছিলাম সেই স্টুডিওঅলা। স্টুডিওগুলোতে তখন গিঁট দেয়া টাই সাজানো থাকত। দুয়েকটা কালো এবং খয়েরি রঙের ব্লেজারও থাকত। পাসপোর্ট সাইজের ছবি শুনলেই টাইটা গলায় লাগিয়ে দিত ফটোগ্রাফার, ব্লেজার পরিয়ে দিত। পাসপোর্টের জন্য আমি ছবি তুলেছিলাম লক্ষ্মীবাজারের কালাম স্টুডিও থেকে। সেদিনের পর প্রথম টাই পরতে হলো হলিডে ইনে কাজ করতে গিয়ে। কিন্তু আমি টাই বাঁধতে জানি না। সোয়ার্ত স্ট্রাসেতে আমার সঙ্গে থাকত কামাল নামে এক যুবক। সে বেঁধে দিয়েছিল। টাই বাঁধার জন্য একটা কায়দাও শিখিয়ে দিয়েছিল। সেই কায়দাটা আজ আর আমার মনে নেই। ভুলে গেছি। হলিডে ইনে আমার কাজ ছিল সারা হোটেল ঘুরে বেড়ানো, কোথাও কোনো ময়লা-নোংরা আছে কিনা সেটা দেখা এবং পরিষ্কার করা। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কার্পেট পরিষ্কার করা। কখনো কখনো বোর্ডারদের লাগেজ ট্রলিতে করে রুমে পৌঁছে দেয়া। গাড়ির ক্যারিয়ার থেকে তাদের লাগেজ নামানো ইত্যাদি। সেই কাজে ভালো টিপসও পাওয়া যেত। আমার বয়সী অনেক ছেলেমেয়েই কাজ করত হলিডে ইনে। একটি অস্ট্রিয়ান মেয়ে আমাকে খুব পছন্দ করত। কিন্তু আমার তাকে একদমই পছন্দ ছিল না। মেয়েটি দেখতে একটু ঘোড়া ঘোড়া টাইপের ছিল। এই হোটেলে আমি একবার একটা পুরস্কার পেয়ে গেলাম।

সেটা ছিল হোটেল কর্তৃপক্ষের একটা কারসাজি। কারসাজি না বলে বিজনেস পলিসি বা এই ধরনের কিছু বলা ভালো। অথবা পুরস্কারটির উদ্দেশ্য ছিল তাদের স্টাফরা বোর্ডারদের কেমন সার্ভিস দিচ্ছে, বোর্ডাররা কোন কোন স্টাফকে পছন্দ করছে ইত্যাদি সেটা স্টাফদের বোঝানো।

ব্যাপারটা ছিল সাতদিনের একটা জরিপ। এই সাতদিনে হোটেলে যারা আসছে, থাকছে, চলে যাচ্ছে তাদের একটা করে ফরম দেয়া হচ্ছে। সেই ফরমে তারা লিখে দেবে হলিডে ইনের কোন কোন স্টাফ ভালো ব্যবহার এবং সার্ভিস দিচ্ছে। কাকে কাকে বোর্ডাররা পছন্দ করছে। এই জরিপে দেখা গেল আমি হাইয়েস্ট ভোট পেয়েছি। শুনে আমি একেবারে হতভম্ব। কারণ এরকম একটা কা যে হোটেলে চলছে আমি তা জানিই না। কখন কোন ফাঁকে কে আমার বুকের নেমপ্লেট দেখে সেই ফরমে আমার নাম লিখে দিয়েছে, আমার খবরই নেই।

পুরস্কার বিতরণের দিন বেশ একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল হোটেলে। আমার শিফট শেষ হলো বিকেল পাঁচটায়। তারপর হোটেলের পোশাক ছেড়ে মাঝারি সাইজের হলরুমে গিয়ে

এই জরিপে দেখা গেল আমি হাইয়েস্ট ভোট পেয়েছি। শুনে আমি একেবারে হতভম্ব। কারণ এরকম একটা কা যে হোটেলে চলছে আমি তা জানিই না। কখন কোন ফাঁকে কে আমার বুকের নেমপ্লেট দেখে সেই ফরমে আমার নাম লিখে দিয়েছে, আমার খবরই নেই।

ঢুকেছি। দেখি হোটেলের হোমরা-চোমরা প্রায় সবাই সেখানে আছেন। চা-কফি-বিয়ার যার যা ইচ্ছা খাচ্ছে। আমি ফার্স্ট হয়েছি। সেকেন্ড, থার্ড হয়েছে দুটি জার্মান মেয়ে। সে সময় আমেরিকা থেকে হলিডে ইনের মালিকদের একজন এসেছেন সিনডেলফিনগেনে। তিনি এসেছিলেন নতুন মডেলের একটা মার্সিডিজের অর্ডার দিতে। তাকে সেই অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট করা হয়েছে। ভদ্রলোক আমেরিকান ইংরেজিতে বেশ মজা করে একটা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার শেষদিকে এসে বললেন, এই প্রতিযোগিতায় যিনি ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছেন

তাকে মহিলারা বেশি ভোট দিয়েছে। শুনে বেশ একটা হাসির হুল্লোড় হলো। আমি খুব লাজুক হয়ে গেলাম। পুরস্কার হিসেবে আমাদেরকে দেয়া হলো একটা বেশ দামি শ্যাম্পেন।

সেদিন থেকে হলিডে ইনে আমার মর্যাদা খুব বেড়ে গেল। বস লোকটি আমাকে পটাতে লাগলেন, যত দ্রুত সম্ভব আমি যেন জার্মান ভাষাটা শিখে ফেলি। তাহলে চাকরিতে আমার খুবই উন্নতি হবে। কর্তৃপক্ষ আমার ওপর বেজায় খুশি। হলিডে ইনের চাকরিতে ইংরেজিটাও লাগে। আমি যেটুকু ইংরেজি জানি তাতে কাজ চলে যাবে। শুধু জার্মানটা ভালো করে শিখতে হবে।

জার্মান ভাষা শেখার ব্যাপারে এর আগে একটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল সেই কসাইখানায়, হের হানের আন্ডারে কাজ করতে গিয়ে।

আগেই বলেছি আমাদের দলের প্রায় সবাই ছিল বাংলাদেশি, পাকিস্তানি আর শ্রীলঙ্কান। একটা জার্মান কিংবা ইউরোপিয়ান দলও ছিল। তাদের অবস্থা ছিল কুলীন ব্রাহ্মণদের মতো। ওরা কাজ করত আলাদা জায়গায়, আমাদের সঙ্গে মিশত না। ওদের স্টুন্ডেলোন, অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টার বেতন ছিল বেশি। তো আমরা দরিদ্র এশিয়ান, যেহেতু জার্মানিতে এসেছি পেটের দায়ে, কাজ করে খেতে হবে, এজন্য কসাইখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের জার্মান ভাষা শেখানোর একটা দায়িত্ব নিজেদের স্বার্থেই নিল। ছুটির এক ঘণ্টা আগে ক্যান্টিনে আমাদের ভাষা শেখার ক্লাস শুরু হয়ে গেল। কাজের দিনগুলোয় এক ঘণ্টা করে শিখব। এজন্য আলাদা কোনো পয়সা লাগবে না। এমনকি বইপত্রও কর্তৃপক্ষ দেবে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু শেখা। আবার ওই এক ঘণ্টার জন্য বেতনও কাটা যাবে না। খুবই উপাদেয় ব্যবস্থা।

গভীর আগ্রহে লেখাপড়া শুরু করে দিলাম আমরা। একজন টিচার আমাদের ভাষা শেখাতে শুরু করলেন। ভদ্রলোক বেশ স্মার্ট, ইংরেজি উচ্চারণ সুন্দর। হাসি হাসি মুখে জার্মান ভাষার এ বি সি ডি থেকে শুরু করলেন। প্রথম প্রথম খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়ছি আমরা। এটা ওটা জিজ্ঞেস করছি। দিন দশেকের মাথায় আগ্রহ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললাম। আমার মতো অবস্থা দেখি প্রায় সবারই। টিচার কাউকে কোনো প্রশ্ন করলে ঠিকঠাক উত্তর দিতেই পারে না।

টিচারের মুখ থেকে হাসি ক্রমশ উধাও হতে লাগল।

এসবের কয়েকদিন পর আপনা আপনিই লেখাপড়া আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। তার দু'তিনদিন পর পুরো দলটি একসঙ্গে 'কুইনডিগুং' খেল। অর্থাৎ কাজ চলে যাওয়ার নোটিশ পেল। জার্মান ভাষা শেখা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল আমার।

শুরু থেকেই ভাষাটি আমার কাছে খুবই খটরমটর লাগছিল। শেখার তেমন কোনো আগ্রহবোধই করিনি। হলিডে ইনে এসে আবার সেই ভাষা শেখার চাপ কিংবা অনুরোধ!

এবার নিজেই চাকরিটা আমি ছেড়ে দিলাম। পুরস্কার পাওয়ার মাসখানেকের মাথায়। হোটেল কর্তৃপক্ষ হতভম্ব। এত ভালো সুযোগ-সুবিধা তারা আমাকে দিতে চাইল আর আমি কিনা চাকরিই ছেড়ে দিলাম!

শুরু থেকেই ভাষাটি আমার কাছে খুবই খটরমটর লাগছিল। শেখার তেমন কোনো আগ্রহবোধই করিনি। হলিডে ইনে এসে আবার সেই ভাষা শেখার চাপ কিংবা অনুরোধ!

আমার তখনকার মনের অবস্থা নিতাইচরণের মতো।

নিতাইচরণ আমার 'যাবজ্জীবন' উপন্যাসের একটি চরিত্র। যুবকটি ছিল নাপিত কিন্তু খুবই রূপবান। নাপিতের কাজ করতে করতে খুবই মনোকষ্টে ভুগত সে। তার শুধু মনে হতো, মানুষের বগল চাঁছতে চাঁছতেই কি এই জীবনটা চলে যাবে? না, এই জীবনটা তাকে বদলাতে হবে। তারপর এক রাতে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমিও হলিডে ইনের কাজ ছেড়ে পালিয়ে এলাম।

দ্বিতীয়বার জার্মানিতে গিয়ে এই হলিডে ইনেই ঘটল এক ঘটনা। সেই ঘটনা বলার আগে কুয়ালালামপুর পর্বটি শেষ করি। কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টের কফি শপে বসে একশ' ডলারের নাটকটি করার পর আমার মনে পড়ছিল এই কুয়ালালামপুর থেকেই আইসিসি ট্রফি জিতে নিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। কী যে স্মরণীয় দিন সেটি! আমি তখন গে ারিয়ায় থাকি। চারতলায় ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট। টেলিভিশনের পর্দায় দেখছি কুয়ালালামপুরের মাঠে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের তুখোড় ক্রিকেটার পাইলট। আর একটি মাত্র রান দরকার। বলও বোধহয় একটি। সারাদেশ স্তব্ধ হয়ে আছে। কী হয়, কী হয়! আমার বড় মেয়েটি তখন ক্লাস এইটে পড়ে। ওই মুহূর্তের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থাটি সে সামলাতে পারছিল না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় যেন মরে যাচ্ছে। একসময় টেলিভিশনের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। উঠে জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া পড়তে লাগল, আল্লাহ বাংলাদেশকে জিতিয়ে দাও। বাংলাদেশকে জিতিয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ রহম কর।

মেয়ের সেই করুণ আকুতি দেখে জলে আমার চোখ ভরে গিয়েছিল।
সেদিন এমন আকুতি দেশের প্রায় সব মানুষেরই ছিল। আমরা যে আমাদের দেশটিকে কত ভালোবাসি, একাত্তরের পর সেদিন আমি আবার নতুন করে তা টের পেয়েছিলাম। এই কুয়ালালামপুরে রেকর্ড সৃষ্টি করে গেল আমাদের সোনার ছেলেরা। জয়ের জন্য যে রানটি দরকার ছিল পাইলট ঠিকই তা নিয়ে নিল। আহ্, তারপর আমার মেয়ের মুখটি যে কী উজ্জ্বল হলো! যেন পৃথিবীর সব আলো একসঙ্গে এসে পড়ল তার মুখে।

কুয়ালালামপুর থেকে নারিতার প্লেনে উঠে আমি মনে মনে বললাম, ভালো থেকো, কুয়ালালামপুর।